International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-III, May 2026, Page No. 01-13
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.03W.317

হরিভূষণ পালের ছোটগল্পে অন্তর্জীবনের ভাষা: প্রেম, মনস্তত্ত্ব ও দাম্পত্য সম্পর্ক

দীপক দে

অতিথি প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত

Received: 26.05.2026; Accepted: 29.05.2026; Available online: 31.05.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper explores the representation of inner life in the short stories of Haribhushan Pal with special emphasis on love, psychology, and marital relationships. As an important voice in the Bengali literary tradition of Tripura, Haribhushan Pal portrays human emotions through subtle narration, restrained expression, and psychological depth. His stories avoid excessive dramatic conflict; instead, they focus on the silent movements of the human mind, the complexities of memory, emotional insecurity, and the fragile nature of interpersonal relationships. The paper analyses several selected stories such as 'Saap', 'Porar Table', 'Mounamukhar', 'Faatal' to examine how the writer presents romantic love, unexpressed desire, nostalgia, suspicion, trust, and emotional distance within domestic life. In these stories, love is not merely a romantic experience but a deeply psychological state shaped by memory, silence, and inner conflict. Pal's characters often struggle between past and present emotions, resulting in subtle tensions within conjugal relationships. The study further highlights the author's artistic craftsmanship in depicting middle-class Bengali social life and everyday experiences through simple yet evocative language. His narratives reveal that human relationships are sustained not only by social institutions but also by emotional understanding, mutual trust, and moral sensitivity. Ultimately, Haribhushan Pal's short stories emerge as profound explorations of the human psyche, where inner emotions become the true language of life and relationships.

Keywords: Love, Psychology, Marital Relationship, Inner Consciousness, Memory, Human Emotion, Bengali Short Story, Middle-class Society, Suspicion and Trust, Haribhushan Pal

প্রেম মানবজীবনের এক শ্বাশ্বত অনুভূতির নাম। বিশ্বসাহিত্যের প্রতিটি অঙ্গনে এই অনুভূতি নানা রূপে, নানা রঙে মৌল আকল্প রূপে চিত্রিত হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের ছোট্ট পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরার বিশিষ্ট কথাকারদের প্রেমের অনুভূতি নানাভাবে ফুটে উঠেছে। এই অঞ্চলের ছোটগল্প চর্চায় কথাসাহিত্যিক হরিভূষণ পাল প্রেমের কথা ও নারী-পুরুষের আকর্ষণের বর্ণনার সংযত কলম এবং ইঙ্গিতময় ভাষার প্রয়োগ করেছেন। তিনি অতিপ্রকাশে অনিচ্ছুক; তাঁর ছোটগল্পে নর-নারীর প্রেমে শরীরে আকর্ষণ অপেক্ষা মনের ভালবাসাটাই প্রধান হয়ে উঠেছে। তাঁর সৃষ্ট নর-নারীর প্রেম প্রায় সব ক্ষেত্রেই সহজ-সরল পথে অগ্রসর হয়েছে। হরিভূষণ পালের বেশ কিছু গল্পে ধরা পড়েছে নর-নারীর সম্পর্কের ভিন্ন ভিন্ন দিক। যার চমক পাঠক হৃদয়কে আকৃষ্ট করে এবং নব নব রসে সিক্ত করে। প্রেম তাঁর রচনায় কোমলতার আবরণে রচিত হয়েছে।

আর তাঁর গল্পের আরেকটি বিশেষ দিকই হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের বহুমাত্রিক স্তর। দাম্পত্য সম্পর্কে সমাজ স্বীকৃতি একটি প্রধান ও গভীর বিষয়। যে সম্পর্কে দুটি নর-নারী পরস্পর একত্রে বাস করার অনুমতি

পায় এবং সন্তান-সন্ততির জন্ম দিয়ে বংশ পরম্পরা ধরে রাখে। তারা স্বামী স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করে গোটা জীবন সমস্ত রকম পরিস্থিতিতে একসঙ্গে থাকার এবং উভয়ের পরিপূরক হয়ে থাকবার প্রতিশ্রুতি নেয়, অর্থাৎ এক কথায় জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী হওয়ার অনুমোদন পায় সমাজের কাছ থেকে। সেই সঙ্গে দুজনের শারীরিক মিলনকে স্বীকৃতি দেয় এই সম্পর্ক। ফলস্বরূপ দু'টি মানব-মানবীর হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি স্বত্ববোধ তথা অধিকারবোধ জন্ম নেয়। গণ্ডিবদ্ধ এই সম্পর্কের অভ্যন্তরে সুখ-দুঃখের ঢেউ জীবনকে প্লাবিত করে। তাতে কখনো দুটি মনের মধ্যে আনে নীরব মানসিক দূরত্ব, আবার কখনো বা তারা ফিরে পায় তাদের ভালোবাসার হারানো সুর। কেউবা নিজ আশ্রয়, নিরাপত্তা, প্রয়োজনের তাগিদে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই সম্পর্কে আবদ্ধ থেকে যায়, কেউবা সেই সম্পর্ককে ছিন্ন করার সাহস দেখায়। আবার কখনো ছিন্ন করা সম্পর্কের গুরুত্ব ও সত্যতা উপলব্ধি করে অনুশোচনা করে থাকে। ফলে এই সম্পর্ক বৈচিত্র্যময় রূপ ধারণ করে। অনেক সময় এই সম্পর্কের জটিলতাকে বুঝে ওঠা যায় না অর্থাৎ সমাজ দুটি পরিবেশের ভিন্ন সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন বংশ পরম্পরার নর-নারীকে এক সূত্রে বেঁধে দিয়ে একত্রে থাকবার অনুমতি দিলেও দুটি মানুষের মন মানসিকতা গোটা জীবনকে পরিচালিত করে। সেখানেই তৈরি হয় জীবনের জটিলতা। হরিভূষণ পালের গল্প সাহিত্যে দাম্পত্য জটিলতার প্রবলতর রূপ না থাকলেও একটা সূক্ষ্ম সংযত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর প্রেম, মনস্তত্ত্ব ও দাম্পত্য জীবনকেন্দ্রিক গল্পে প্রেমের রোমান্টিক অনুভূতি, অসম প্রেম, অতীত প্রেমের স্মৃতি, দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন, নারী মনস্তত্ত্ব, পুরুষ মনস্তত্ত্ব, অতীতচারিতা প্রভৃতি বিষয় সহজ অনুকরণীয় শৈলীতে রূপায়িত হয়েছে। ত্রিপুরার বিশিষ্ট গবেষক নারায়ণ ভট্টাচার্য বলেছেন—

> "হরিভূষণ পাল প্রেমের কাহিনি ও চরিত্রাঙ্কনে যেমন অসম প্রেমের চিত্র অঙ্কন করেছেন, তেমনি রোমান্টিক প্রেমের চিত্রও অঙ্কন করেছেন, আবার বাস্তব জীবনে ঘটে যাওয়া প্রেমের কাহিনিও রূপায়িত করেছেন। তবে প্রেমের জটিলতা, মানসিক সংকটের তীব্রতা, দ্বন্দ্ব প্রেমের বিশেষ কোনো তাৎপর্য তাঁর গল্পে দেখা যায় না। বরং তাঁর প্রেমের কাহিনি ও চরিত্র সরল রেখায় চলাচল করেছে।"[১]

কথাকারের প্রেম ও মনস্তত্ত্বসম্মত ভুবনের মোট আটটি গল্প উক্ত অভিসন্দর্ভে আলোচিত হয়েছে, যথা—'সাপ', 'পড়ার টেবিল', 'মৌনমুখর', 'অন্তর্লীনা', 'এক অন্য প্রেমের গল্প', 'শেওলা', 'কথা বেচা কেনার কথা', 'ফাটল' প্রভৃতি।

'আগামীকাল চব্বিশ ঘন্টা ত্রিপুরা বন্ধ' গল্প সংকলনের অন্তর্গত 'সাপ' গল্পে অরুনিমা তথা অরুনা আর সন্দীপ চরিত্রের মধ্য দিয়ে গল্পকার হরিভূষণ পাল দাম্পত্য জীবনের এক অনুক্ত অধ্যায় উচ্চারণ করেছেন। গল্পটিতে জটিল কোন দর্শন নেই। অথচ এর ভেতর লুকিয়ে আছে অন্য এক গল্প। আছে জীবন সম্পর্কে গভীর এক প্রত্যয়। গল্প কাহিনিতে একটি সাপ অরুনার ঘরে প্রবেশ করলে সে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। এই সাপটিকে অরুনা এবং তার স্বামী খুঁজতে গিয়েই ট্রাঙ্কভর্তি অতীত জীবনের নানা স্মৃতি খুঁজে পায়। এরই মাঝে সন্দীপের হাতে লাগে অরুনার স্মৃতি বিজড়িত এক ছবি। এই ছবিটিকে কেন্দ্র করে সন্দীপ-অরুণার দাম্পত্য জীবনে এক অনাবিষ্কৃত অধ্যায়ের উন্মোচন করেছেন লেখক।

সন্দীপ অরুনার ভালবাসায় পূর্ণ সুখের সংসার। মান-অভিমান, ভালোবাসা, অধিকারবোধ এবং প্রগাঢ় বিশ্বাসে গড়া তাদের দাম্পত্য জীবনে ঢেউ তুলে এই ছবিটি। ছবিটিতে অরুনার পরিবারের সঙ্গে রয়েছে তার পিসতুতো ভাই-এর বন্ধু সুদর্শন যুবক দিব্যেন্দু। ছবিটিকে কেন্দ্র করে হাসি-ঠাট্টা দিয়ে তাদের কথোপকথন শুরু হলেও এ ছবি তাদের দুজনের সুখের সংসারের একটি অংশ দখল করে নিয়েছিল। তাদের ভালবাসার গভীরতায় এই ছবি এতদিন মূল্য পায়নি। সময়ের প্রলেপে সবকিছুই ধুয়ে মুছে যায় একসময়। তাদের

দুজনের ছোট্ট সংসারে কোন কিছুই চির ধরাতে পারেনি কখনো। অরুনা সন্দীপকে বলেছিল ছবিখানি তার মামাতো বোন নিয়ে গেছে। কিন্তু আজ হঠাৎ ছবিটি পাওয়ার পর সন্দ্বীপের হৃদয় অভিমান, হিংসা এবং সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সন্দ্বীপের মনে নানান প্রশ্ন জাগতে শুরু করে—

> "তোমাদের ভাইবোনদের পিকনিকের ছবিতে হঠাৎ করে পিসতুতো ভাই-এর বন্ধু এসে হাজির হলেন কেন? তাও একেবারে ছবির মধ্যমণি হয়ে?... সবার সাথেই পরিচয় ছিল? তা তোমার সাথে কতদিনের পরিচয়? ছবি দেখে তো মনে হচ্ছে ভদ্রলোক তোমার দিকেই তাকিয়ে আছে সারাক্ষণ!... শেষের দিকে হয়তো আরও অনেক অন্তরঙ্গ দৃশ্যও থাকতে পারে। ওসব আমার না দেখাই ভাল।"[২]

এই সকল প্রশ্নপর্ব ঠাট্টা-তামাশা দিয়ে শুরু হলেও স্বামীর হৃদয়ের ক্রমশ জমা হয়েছে একরাশ অভিমান । তারপর গল্পকাহিনি লেখকের কুশীলব বর্ণনায় ফ্ল্যাশব্যাকে চলে যায়। একদিন সন্দীপ অরুণা পুরীতে বেড়াতে গিয়ে সমুদ্র সৈকতের মাঝখানে দিব্যেন্দুর মুখোমুখি হয়। তখন দিব্যেন্দু অরুণাকে রুনি নামে ডেকে একটি ঝিনুকের মালা কিনে দেয়। আর তাতেই যেন সন্দীপের মনে প্লাবনের ঝড় ওঠে। লেখকের ভাষায়—

> "নামটি যেন অনেক অন্তরঙ্গতার ফসল। সে আরো জানল পিকনিকের ছবিটি ছাড়া আরও অনেক ছবি রয়েছে তাদের। অরুণা যা কখনো বলেনি বা দেখায়নি। এখন সন্দ্বীপের এও মনে হতে লাগল, ভদ্রলোকের সাথে দেখা হবার পর থেকে অরুনা যেন কেমন আড়ষ্ট। সে যেন ঠিক স্বাভাবিক হতে পারছে না।"[৩]

অরুণার মনের আড়ষ্টতা কি প্রাক্তন প্রেমিকের সাথে দেখা হওয়ার জন্য? নাকি অতীত প্রেম ভুলতে না পারার জন্য? সময়ের প্রলেপে হয়তো অনেক কিছুই ধুয়ে মুছে যায়। কিন্তু অরুনার মনের এই উথাল-পাথাল দশা তো অতীত প্রেমেরই জানান দেয়। কারণ—

> "রাতের সব তারাই আছে
> দিনের আলোর গভীরে।"[৪]

সন্দীপ অরুণাকে বলেছিল ঝিনুকের মালাটি পুরি থেকে ফেরার পথে ফেলে এসেছে। কিন্তু আজ মালাটিও অরুণা খুঁজে পায় ট্রাঙ্কের মধ্যে। সন্দীপ 'হঠাৎ দেখা'র প্রেমিকের মতো নিস্তব্ধ। তাদের কারোর মুখেই এখন ভাষা নেই। কিন্তু মনের ভিতর জলোপ্লাবনের ন্যায় উত্তাল আবহাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে। গল্পকার লিখেছে—

> "মালাটি হাতে নিয়ে সে তাকালো সন্দ্বীপের দিকে। তখন জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে।"[৫]

অরুনার মনেও জেগে ওঠে পূর্ব প্রেমের অবর্ণিত স্মৃতি। যা সে গোপনে রেখেছে বহুদিন ধরে। এভাবেই প্রেম জেগে থাকে অবচেতন মনের কোথাও না কোথাও। আর বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে সেই প্রেম পুনরায় উঁকি দেয়। আর তাতেই কখনো কখনো বর্তমান দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরে। অরুণা ভাবে তার পূর্ব প্রেমের কথা—

> "যদি দিব্যেন্দু তখন কোন প্রস্তাব দিত? যদি তার চোখের ভাষা মুখে বলতো? কী উত্তর দিতো সে? এখন তো অরুণার এও মনে হয়- তখন সেও চাইতো দিব্যেন্দু তেমন কিছু একটা বলুক। মনের খুব গভীরে হলেও এমন একটি আকাঙ্ক্ষাকে সযত্নে লালন পালন করতে অরুণার তখন ভালো লাগতো।"[৬]

এসব ভাবতে ভাবতেই তারা ঘুমোতে যায়। কিন্তু আজ তাদের দাম্পত্য জীবনের সংশয়ের চিহ্ন প্রবলতর রূপ লাভ করেছে। এই ফাটল কি আর জোড়া লাগবে? অরুণা সন্দীপকে প্রশ্ন করে—

> "আচ্ছা, তুমি সত্যি সত্যি সাপটাকে চলে যেতে দেখেছ?... 'না'। সন্দীপের নির্বিকার উত্তর।... এখানেই আছে কোথাও, হয়তো ঘুমিয়ে আছে।... এ ঘরেই ঘুমিয়ে আছে হয়তো। তোমার আমার মনের মধ্যেই কোথাও।"[৭]

থমকে গেল অরুণা। সে ধীরে ধীরে নিজের বালিশে মাথা রেখে ঘুমানোর চেষ্টা করল। এভাবেই কখনো কখনো অতীত এসে বর্তমান জীবনকে জটিল করে তোলে। এখানে লেখক মানব মনস্তত্ত্বের অসাধারণ বাণী রূপ দিয়েছেন। মানব মনে তো এভাবেই বয়ে চলে কত অনাবিষ্কৃত রহস্য। আর এই রহস্যময় অতীত প্রেমের প্রকাশে কথাকার দার্শনিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

'পড়ার টেবিল' গল্পে লেখক হরিভূষণ পাল কিশোরী মনে প্রথম প্রেমের অনুভূতি সাদামাটা ভাষায় বর্ণনা করেছেন। গল্পের একদিকে বাড়তি বয়সি মেয়ে খুকির প্রতি তার মা মনীষার ব্যাকুলতা এবং অন্যদিকে মায়ের পঁচিশ বছর পূর্বেকার প্রেমের স্মৃতি রোমন্থন লেখক গোটা দুটো জেনারেশনকে কেন্দ্র করে সহজ-সরল ভাষায় তুলে ধরেছেন। মনীষার হৃদয়ে মেয়ে খুকির জন্য মাতৃ হৃদয়ের ব্যাকুলতা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং এই ব্যাকুলতাই তাকে প্রতিদিন নিয়ে যায় মেয়ের পড়ার টেবিলের কাছে। মনীষার কেবল মনে হয়—

> "খুকি যেন এখন একটু তাড়াতাড়ি কলেজ যায়। তার এও মনে হল, মেয়েটা এখন বুঝি আয়নার সামনে একটু বেশীই দাঁড়িয়ে থাকে। মনীষার গুছিয়ে রাখা শাড়ী বের করে সেগুলি পরে কলেজে যাবার আবদার করে।"[৮]

মনীষা জানে মেয়ের এই চাহিদা নিতান্তই স্বাভাবিক। সে এও জানে এই বয়সে মেয়ের জীবনে প্রেম আসাটাও স্বাভাবিক। তবুও সে প্রাণের ব্যাকুলতায় মেয়ের টেবিলে কিছু একটা খুঁজে বেড়ায়। আজ মেয়ের হাতে সে ধরা পরে শসব্যস্ত হয়ে যায়। কিন্তু তার মনেও নানান প্রশ্ন। কী খুঁজতে যায় সে পড়ার টেবিলে? লেখকের বর্ণনায় মনীষার মনে প্রেমের রূপ শিল্প মাধুর্যতায় ব্যক্ত হয়েছে—

> "সে কী খুঁজতে যায় খুকির পড়ার টেবিলে? কিইবা খুঁজে পেতে পারে? আবার ভাবে কত কী-ই তো পেতে পারে। হয়ত ছোট্ট একটি চিরকুট। যাতে থাকবে কোন ছেলের কাঁপা হাতের দুলাইন লেখা। যা থেকে কিছুটা আন্দাজ করে নেওয়া যায়। হয়ত পেতে পারে আকাশ নীল এক টুকরো কাগজ। যাতে থাকবে দু'ছত্র কবিতা, যার সাথে মিশে থাকবে প্রথম যৌবনের কিছু সোনালী আকাঙ্ক্ষা। হয়তোবা দেখতে পাবে বই-এর মাঝে শুকিয়ে আছে একটি ফুল, যার বাসি গন্ধের সাথে মিশে থাকবে কোন নবীন হৃদয়ের কবোষ্ণ উত্তাপ। কে জানে হয়তো খুকির খাতাটিতে দেখে ফেলতে পারে কোন এক প্রাণচঞ্চল তরুণের নাম, যা হয়তো কোন অলস মুহূর্তে খুকিই লিখে রেখেছে নিজের অবচেতনে।"[৯]

প্রেম চিরকালীন এক অনুভূতি। মনীষার জীবনেও এই প্রথম প্রেম এসেছিল। কলেজের কোন এক যুবকের প্রেমে পড়েছিল সে। তখন মনীষার মেজ দিদি তার পড়ার টেবিলে এই একই জিনিস খুঁজে চলত। কিন্তু সদা সতর্ক মনীষার প্রেম কখনোই তার দিদির কাছে ধরা পড়েনি। যদিও তাদের প্রেম পূর্ণতা পায়নি। কিন্তু দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে মেয়ের পড়ার টেবিলকে কেন্দ্র করে তার মনে হারিয়ে যাওয়া প্রেম পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। যা তাকে অশান্ত করে তুলেছে। মনীষা আসলে নিজেকেই খুঁজতে যায় মেয়ের পড়ার টেবিলে। লেখকের ভাষায়—

> "পঁচিশ বছর পরেও মনীষা বুঝতে পারে স্মৃতিটা একটু হয়তো অস্পষ্ট হয়েছে, কিন্তু মিলিয়ে খায়নি। কিছু চারাগাছ যেমন ওপরের দিকে বাড়তে না পেরে মাটির নিচেই

শেকড়ের জালি তৈরি করে অনেকটা জায়গা জুড়ে, তেমনি অনেক পুরানো এই স্মৃতিটাও বাইরের আলো বাতাস না পেয়ে জড়িয়ে রেখেছে তার সারা হৃদয়কে।"[১০]

মনের গহীন গভীরে প্রেম চিরকাল জীবিত থাকে। আবার কোনও এক পরিস্থিতিতে সেই প্রেমের স্মৃতি পুনরায় উদিত হয়ে হৃদয়কে অজানা এক ব্যথায় আর্দ্র করে তোলে। তেমনি—

"মনীষাও যেন আজ তার হৃদয়ের অনেক গভীরে এক চিনচিনে ব্যথা অনুভব করতে থাকে। মনীষা ভাবে পুরানো সেই স্মৃতিটাই তাকে বারবার নিয়ে হাজির করে না তো খুকির পড়ার টেবিলের কাছে?"[১১]

কিন্তু মানব মন সামাজিক বন্ধনে এতটাই জড়িয়ে পড়ে যে সে তার অতীত প্রেমের প্রকাশ করতে চায় না । তাই মনীষাও একই দিনে দুইবার মেয়ের কাছে ধরা পড়তে চায়নি। এভাবেই লেখক প্রেমের চিরন্তন রূপ একটি সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে অসাধারণ মুন্সিয়ানায় রূপায়িত করেছেন।

প্রেম নিরাকার এক বিমূর্ত সত্তা। প্রেম স্থান-কাল-পাত্রের ভেদ মানে না। যেকোনো সময় যেকোনো পরিস্থিতিতে যেকোনো মানুষের মনে প্রেম এসে জীবনকে বৈচিত্রময় করে তুলতে পারে। আমাদের আলোচ্য 'মৌন মুখর' গল্পের নায়ক গোরাপদ এক পথচারিণীর প্রেমে আবদ্ধ হয়েছে। কর্তব্যনিষ্ঠ, সৎ, মানবিক গোরাপদ পেশায় অটোচালক। লেখক হরিভূষণ পালের প্রেমের দর্শনে অতীমানব বিষয় একটি নির্জীব গাড়িও প্রেমের অবলম্বন হয়ে উঠেছে। গল্পের প্রথমেই বর্ণিত হয়েছে অটোরিক্সাটির প্রতি গোরাপদর গভীর ভালোবাসা। একান্ত আপনজনের মতই গোরাপদ অটোটিকে ভালোবেসেছে। লেখকের বর্ণনায়–

"দিনের শেষে যখন তাকে মল্লিকবাবুর গ্যারেজে রেখে আসতে যায় তখন তোয়ালে দিয়ে পরম মমতায় সারাটা শরীর ঝেড়ে মুছে দেয়। অনেক সময় এক মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে অপলক চেয়ে থাকে তার রাজলক্ষীর দিকে। তখন তার সত্যি সত্যি মনে হয় কালো পাড়ের হলুদ শাড়ী পড়ে কোন যুবতীই যেন দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে সলাজ ভঙ্গিমায়। পিঠ চাপড়ে দিয়ে শিস্ দিতে দিতে বাড়ী ফেরে গোরা।"[১২]

গোরা বটতলা থেকে জিবি হাসপাতালের পথে অটো চালায়। পথেই একদিন শ্যামলা রঙের একটি মেয়ে হাতে ছাতা আর ফ্লাক্স নিয়ে তার অটোতে উঠে। গোরা তার অভিজ্ঞতার দরুন মেয়েটির জিবি পৌঁছোনোর অস্থিরতা বুঝে অটোতে স্পিড বাড়িয়ে দেয় এবং তাতেই যেন সে দেখতে পায় মেয়েটির চোখে মুখে এক ধরনের স্বস্তির ছাপ। যথাসময়ে পৌঁছলে মেয়েটি জিবির ভিতরে চলে যায়। তখন গোরা দেখে মেয়েটি ছাতাখানি তার অটোতে ফেলে গেছে। যাত্রীরা অটোতে কিছু ভুলে গেলে বিনয়দা নামের একজনের কাছে তা জমা রাখা হয় এবং যাত্রীরা তার কাছ থেকে নিজের জিনিস পরবর্তী সময়ে খুঁজে নেয়। কিন্তু গোরা কর্তব্যবোধ বা অন্য কোন প্রেরণায় ছাতাখানা নিয়ে মেয়েটিকে খুঁজতে খুঁজতে হাসপাতালের ভিতর এক প্রৌঢ় শীর্ণকায় রোগীর পাশে দেখতে পেল। তারা কোন কথা বলেনি। কিন্তু—

"কৃতজ্ঞতার এক নরম আবেশে ভরে উঠল তার টানা কালো চোখ দুটি। তখুনি চলে আসতে পারতো গোরাপদ। কিন্তু তার মনে হল, এরকম একজন অসুস্থ রোগীর পাশ থেকে কোন কিছু না বলে হুট করে চলে আসাটা কেমন যেন অশোভন। নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরেও তার কিছু বলা উচিৎ। কিন্তু কি বলা যায় সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।"[১৩]

গোরার কর্তব্যপরায়ণ মনোভাব এবং মেয়েটির কৃতজ্ঞতাবোধের জন্যই তাদের পরস্পরের প্রতি এক নীরব প্রেমের অনুভূতি জন্ম নেয়। এই অনুভূতির টানে গোড়া রোগীর জন্য ঔষধ এনে দেয়। তাদের চোখে চোখে এখন কথা শুরু হতে থাকে। গোরা অনুভব করে—

> "মেয়েটি কোন কথা না বলেও অনেক কথাই বলে দিচ্ছে, আর সেও খুব সহজেই তা বুঝে নিচ্ছে । হয়তো সেও অনেক কিছুই বলে চলেছে নীরবে।"[১৪]

অবশেষে গোরা জানতে পারে বৃদ্ধ রোগীটি মেয়েটির বাবা। মেয়েটির চোখের জল দেখে তার চোখ দুটিও জলে ভারী হয়ে আসে। কিন্তু সে মেয়েটিকে সান্তনা বা সাহস দেবার মত কোন কথাই খুঁজে পাচ্ছে না। মেয়েটির জন্য তার বুক ভারি হতে লাগল ক্রমশ। এদিকে গোরার স্ট্যান্ডে ফিরতে দেরি হওয়ায় তার আগে অনেক অটো বটতলার উদ্দেশ্যে চলে যায়। এই নিয়ে বিনয়দার সাথে তার বচসা বাঁধে। তখন বিনয় বলে হাসপাতালে কোন মেয়ের সাথে 'ফস্টি নস্টি' করতে গিয়ে নাম্বার মিস করেছে- এই কথার প্রতিবাদ করতে গিয়ে মেয়েটিকে আসতে দেখে গোরা নিজেকে থামিয়ে দেয়। কিন্তু মেয়েটি যেন নীরব প্রতিবাদের ভঙ্গিতে দাঁতে ঠোঁট কামড়ায়। অবশেষে অন্য অটো বাদ দিয়ে সে গোরার অটোতেই চড়ে। এখনো কোন কথাই হয়নি তাদের মধ্যে। মেয়েটিকে সে সম্ভ্রমের আসনে বসিয়েছে মনে মনে।

এই একদিনের ঘটনা গোরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। দু'দিন পর বটতলায় মেয়েটির সাথে আবার দেখা হয় এবং গোড়ার অটোতে করেই মেয়েটি হাসপাতালে পৌঁছায়। কিন্তু তাদের মধ্যে যেন এক অজানা টান অজানা মিল তৈরি হয়েছে। তাই—

> "এর ধারে কাছে এলে বা ওকে নিয়ে কিছু ভাবতে গেলেই তার বুকটা যেন কেমন দ্রুত ওঠানামা করে। আজও সে দেখল মেয়েটি হাসপাতালের টিলার দিকে এগুচ্ছে। গোরাপদও নিজের অটোখানি বেশ খানিকটা দূরে রেখে, রওনা দিল হাসপাতালের দিকেই। পেছন দিকে একটিবার না তাকিয়েও মেয়েটি যেন ঠিক বুঝে নিল গোরাপদের আসার কথা। চলার গতি একটু কমিয়ে গোরাপদকে তার পাশাপাশি হাঁটার সুযোগ করে দিল। তাল মেলাল গোরাও।"[১৫]

গোরাপদ মেয়েটির নাম রাখলো শ্যামলী। মেয়েটির বাবা সুস্থ হওয়ায় সে হাসপাতালের টিলা নামতে নামতে গোরাকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু গোরা নিজেকে তার সামনে ধরা না দিয়ে মেয়েটির ব্যাকুলতা দেখতে লাগে।—

> "দৃশ্যটা খুব ভাল লাগছে গোরার। তাকে কেউ খুঁজছে, বিশেষ করে প্রায় অপরিচিত এক যুবতী এবং না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠছে দেখে এক অনাবিল তৃপ্তিতে সারা বুক ভারে গেল তার। আড়াল থেকেই গোরা দেখল শ্যামলী যেন অনেক অভিমান বুকে নিয়েই দূরে দাঁড়িয়ে থাকা রাজলক্ষ্মীর সীটে বসে রইল। খুব হাল্কা পায়ে এবার এগিয়ে গেল গোরা।"[১৬]

এরমধ্যে তাদের দুজনের মনে অজানা এক কষ্ট দানা বেঁধে উঠলো। কারণ "মেয়েটির বাবাকে কাল বিকেলেই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে"- এই মন্তব্যই গোড়ার প্রতি শ্যামলীর প্রথম কথা বলা। তাদের মনে যেন হারিয়ে যাওয়ার কষ্ট। তাদের দুজনেরই মনে অনেক না বলা কথা জমে রয়েছে। অবশেষে চলতি অটো থামিয়ে গোরা কোন এক বাগানে প্রবেশ করে রামধনুর রং আর প্রজাপতির বৈচিত্র্যে ভরা পরিবেশ দেখতে লাগল। শ্যামলী কিছু বুঝতে না পেরে অটো থেকে নেমে বাগানের প্রবেশ পথে এসে দাঁড়াল।—

> "মুখে কিছু না বললেও গোরাপদ বুঝতে পারল শ্যামলী ওখানে তার জন্যই অপেক্ষা করছে। গাড়ি থেকে নেমে সে-ও পা বাড়াল ঐ একই পথের দিকে।"[১৭]

এখানেই গল্পের পরিসমাপ্তি। গোরা ও শ্যামলীর জীবন এক হয়ে যাওয়ার যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তাতেই গল্পটির আবেদন হয়ে উঠেছে চিরকালীন। লেখক এভাবেই দুজন অপরিচিত যুবক-যুবতির প্রেমের পূর্ণতা প্রাপ্তির দৃশ্য সহজ-সরল ভাষায় চিত্রাঙ্কন করেছেন।

'অন্তর্লীনা' গল্পে কিশোর-কিশোরীর মনে নব অঙ্কুরিত প্রেমের চিত্র লেখক সরল মাধুর্যে অঙ্কন করেছেন। গল্পের নায়ক শ্রীকান্ত নব যৌবনের স্বাভাবিক আবেগ নিয়ে শিমুলতলায় পিসির বাড়িতে বিয়ে উপলক্ষ্যে বেড়াতে এসে এক কিশোরী কন্যা মনির প্রেমে নিজের অজান্তেই জড়িয়ে পড়ে। প্রাণচঞ্চল, কৌতুকপ্রিয় মনি নিত্যনতুন কায়দায় শ্রীকান্তকে জব্দ করে চলেছে। মনির কথার ফুলজুরিতে শ্রীকান্তের পৌরুষ যেন বিঘ্নিত হয়েছে বারবার। শ্রীকান্তও একসময় মনিকে অবহেলা করতে শুরু করে। শ্রীকান্তের এহেন অবহেলায় মনি ক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু প্রথম দিকে আড়ষ্ট হয়ে থাকা শ্রীকান্ত ধীরে ধীরে মনিকে ভালোবেসে ফেলে এবং মনির মনেও শ্রীকান্তের জন্য হৃদয়াবেগ সঞ্চারিত হয়।

নারীর হৃদয় সমুদ্রের অতল গভীরে তলিয়ে থাকা ঝিনুকের ন্যায়। তাকে ধরতে গেলে সু-ডুবুড়ী হতে হয়। শ্রীকান্ত মনির এই চঞ্চলতা, তাকে শায়েস্তা করার ভেতরকার প্রেম প্রথমে বুঝতে পারেনি। তাই সে মনিকে অবহেলা করেছে। কিন্তু মনির মধ্যেও রয়েছে এক চৌম্বকীয় শক্তি। যার প্রতি শ্রীকান্ত ক্রমেই আকর্ষিত হতে থাকে। লেখকের বয়ানে—

> "বিয়েবাড়ীর শত ব্যস্ততার মধ্যেও এক অদৃশ্য টানাপোড়েন চলছে তাদের দুজনের মধ্যে। শ্রীকান্তের ক্রমেই ভাল লাগছে। মনির নিকট সান্নিধ্যের জন্য সে যেন উন্মুখ হয়ে থাকে। আবার ধারে কাছে এলেও সতর্ক হয়ে যায়। মেয়েটির মাথায় সবসময় যেন দুষ্ট বুদ্ধি কিলবিল করছে। এর মধ্যে বার দুই সে তাকে বৌদিদের কাছেও হেনস্থা করেছে। তবু ভাল লাগছে তার। মনি কাছে এলে তার বুকের অনেক ভেতরে কোথায় যেন কেঁপে ওঠে। তার মনে হতে লাগল, হয়তো মনির বুকের ভেতরেও এমন কাঁপন ওঠে।"[১৮]

মনি কথায় কথায় শ্রীকান্তকে মিথ্যুক বলেছে। কিন্তু এর মধ্যেও ছিল গভীর ভালোবাসা। একসময় শ্রীকান্ত মনির হৃদয় বুঝতে পারল। তার এহেন জব্দ করার মধ্যেও যে ছিল এক প্রকার প্রেম— তা শ্রীকান্ত বুঝল। সে এখন ক্রমে পাক্কা ডুবুরি হয়ে মনির হৃদয়ের অতল গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছে। একদিন মনির ছেলেমানুষীতে শ্রীকান্ত সহ সাইকেল থেকে পড়ে ভীষণ চোট পায়। রাতে মনির প্রচন্ড জ্বর হয় এবং শ্রীকান্ত রাতে খুব সন্তর্পনে এসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। শ্রীকান্ত মনির বেদনা নিজের হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে চাইল। গল্পকার লিখেছেন—

> "এক দৃষ্টিতে শ্রীকান্ত চেয়ে থাকলো যন্ত্রনাবিদ্ধ ছোট্ট সুন্দর মুখখানির দিকে। তার বুকের মধ্যে কেমন যেন রিন রিন করে কিছু বেজে চলেছে। তার খুব লোভ হল মনিকে ছুঁয়ে দেখতে। খুব আস্তে, খুব সন্তর্পনে ছোট্ট কপালটিতে হাত রাখল সে।"[১৯]

এর পরের দিনই শ্রীকান্ত বাড়ি যাওয়ার জন্য রওনা দিল। সবার সাথে তার দেখা হলেও মনি অনুপস্থিত। শ্রীকান্ত বুঝে নিল এই অনুপস্থিতির কারণ। হয়তো দেখা হলে তারা নিজেকে সামলাতে পারত না। অজান্তেই সকালের প্রকাশ্যে চলে আসতো তাদের ভালোবাসা। শ্রীকান্ত অনেকটা পথ পেরিয়ে আসার পর মনিকে দেখল অনেকটা দূরে তার দিকে তাকিয়ে আছে। শ্রীকান্ত পেছন ফিরে দেখতেই মনি লুকে গেল। তারপর কেটে গেল পনেরো বছর। শিমুলতলার এই সুখস্মৃতি শ্রীকান্ত এবং মনি দুজনেই সযত্নে মনের গভীরে সাজিয়ে রেখেছে। এতদিন পর তারা দুজনেই তাদের স্মৃতির অলিন্দ থেকে সুখের মুহূর্তগুলি নিয়ে গল্প লিখে পত্রিকায় প্রকাশ করল। এই লেখাকে কেন্দ্র করেই আবার পনেরো বছর পরে তারা মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে দীর্ঘনিরবতা। অবশেষে নীরবতার বাঁধ ভেঙে শ্রীকান্ত মনিকে 'আপনি' সম্মোধন করে কথা বলতে চাইলে মনি পনেরো বছর আগের সুরে বলে—

> "তুমি আমাকে আপনি বলতে পারলে? তোমার জিভে আটকালো না? তুমি আসলে একটি মিচকে শয়তান, একটা ভিজে বেড়াল, একটা আস্ত ডাকাত!"[২০]

তখন শ্রীকান্তর মনে পুনর্জাগরিত প্রেমিক সত্তা বলে ওঠে— "আরে আরে এক নাগাড়ে এত মিথ্যে কথা বললে জিহ্বা ভারী হয়ে যাবে যে! শেষে তোৎলাতে হবে সারাটা জীবন।"[২১]
আর তাতেই— "দুজনের উচ্ছ্বসিত হাসিতে পনের বছরের দূরত্বের পর্দাটা দূর হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তে।"[২২]

এভাবেও একটি সত্য প্রেম দীর্ঘ পনেরো বছর পরেও পূর্ণতা পায়। লেখকের সংক্ষিপ্ততম উপসংহারে শ্রীকান্ত-মনির রোমান্টিক মানসিকতা অত্যন্ত মধুর হয়েছে এবং লেখকের পরিশীলিত রুচিবোধের পরিচয় ঘটেছে।

'এক অন্য প্রেমের গল্প'-এ লেখক এক অসম প্রেমের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। নায়কের একপাক্ষিক প্রেমের ভাবনাতেই গল্পকাহিনি এগিয়ে গেছে। এক ঝড় বৃষ্টির দিনে অফিস ছুটির পর অফিসকর্মী মনীষাকে রিক্সাওয়ালা বিশু বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি পৌঁছে দেয়। অতিব্যস্ত মনীষার শান্ত কমনীয় চোখ দুটি বিশুর মনে দায়িত্বশীল পৌরুষের জাগরণ ঘটায়। আর এই দায়িত্বশীলতা থেকেই প্রতিদিন মনীষাকে অফিস থেকে নিয়ে যেতে যেতে বিশুর মনে প্রেমের অনুভূতি জাগে। সেদিনের বৃষ্টিতে বিশু জ্বর আর সর্দি কাশিতে অসুস্থ হয়ে দুদিন রিক্সা চালাতে পারেনি। কিন্তু মনীষার সঙ্গে চোখাচোখি হবার পর থেকে বিশু— "তার বুকের অনেক গভীরে কোথায় যেন মৃদু সুরের এক গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছে।"[২৩]

ক্রমে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার এক নীরব আবহাওয়ায় দুজনেই যেন তাদের মনের কথা বুঝে নিতে পারে সহজে। বিশুর মনে এই অনুভূতি ক্রমশ গাঢ় হতে থাকে। রিক্সায় এখন বিশু মনীষার সাথে একা সময় কাটাতে চায়। অন্য কেউ মনীষার সাথে থাকলে তার হিংসা হয়। এতো ভালোবাসারই অন্যতম লক্ষণ। কিন্তু পরক্ষণেই বিশুর মনে প্রশ্ন জাগে—

> "এ কোন্ খেলায় মেতেছে সে। কী আশা করে সে মনীষার কাছে? আবার খুব বিবেচকের মতই ভাবে, তেমন বেশি কিছুতো নয়। মনীষাকে দেখলে তার ভালো লাগে। খুশীর একটু ছোঁয়া পায়, এতে দোষটা কোথায়? মনীষার চোখের দিকে তাকালে তার বুকে কাঁপন ওঠে, ধারেকাছে এলে হৃদয়ে দোলা লাগে, এ তো আর মিথ্যে নয়। এটা হয়তো শুধুই ভালো লাগা; হয়তো ভালোবাসা নয়, প্রেম নয়, শুধুই ভালো লাগা। মনীষা হয়তো এর কিছুই জানে না। বিশু ভাবে, তার জানারও দরকার নেই। সে শুধু চায় তার ভালোলাগার মনীষা তার রিক্সাতে সবসময় একাই উঠে বসুক। সেই সবসময় তাকে পৌঁছে দেবে। প্রয়োজন হলে যুগ-যুগান্তর ধরে। এর বেশি কিছু সে চায় না।"[২৪]

এরপর দীর্ঘদিন প্রায় দু'বছর অফিস ছুটির পর বিশু মনীষাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু একদিন সব উলটপালট হয়ে গেল। বিশু জানতে পারলো বিরুপাক্ষ নামে এক ছেলের সাথে মনীষার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। নীরব অভিমান, ঈর্ষা আর ক্ষোভে বিশু জানালো বিরুপাক্ষ অত্যন্ত খারাপ লোক। পরের দিন বিশুর রিক্সায় বাড়ির সামনে পৌঁছে রিক্সায় বসে থেকেই মনীষা বিশুকে বলল যে, বিরুপাক্ষ খুব ভালো ছেলে এবং তার সঙ্গে মনীষার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। তারপর বাড়ির গলির দিকে পা বাড়াল মনীষা এবং একটু থেমে বিশুকে বলল— "তুমিও খুব ভাল। খুব ভালমানুষ। তোমার কথা আমার অনেক দিন মনে থাকবে।"[২৫]

ধীরে ধীরে মনীষা বাড়ির গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল বিশু এবং কিছুক্ষণ পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিশে গেল আর দশটা রিক্সার মিছিলে। গল্পে প্রেমমুগ্ধ বিশুর নীরব প্রেমের আবেগ ও বিশুর চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। মনীষা প্রতিদিন বিশুর প্রেমের অর্ঘ্য গ্রহণ করেছে। তবে মন দেওয়া-নেওয়ার বিষয়টি

এই গল্পে নেই। তাই গল্পের শেষাংশে মনীষাকে স্বার্থপর বলে মনে হয়েছে এবং বিশুর বিপর্যস্ত অবস্থা আমাদের মনকে নাড়া দেয়।

আমরা প্রতিদিন যে জীবন নিয়ে চলছি তাতে বর্ণ-গন্ধ নেই, তা বাঁধা পথে ঘুরে ক্লান্ত। কিন্তু প্রকৃতির কোন বিশেষ আবির্ভাবক্ষণে আমাদের মনে পুনরায় জাগিয়ে তুলে হারিয়ে যাওয়া প্রেমের অনুভূতি। ক্ষণিকের জন্য আমরা বর্তমান থেকে অতীতে গিয়ে কৈশোরের প্রথম প্রেমের অনুভূতিতে মোহিত হয়ে উঠি। আবার ঘোর ভাঙ্গতেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বর্তমানে পা রাখি। জীবন এভাবেই চলে। হরিভূষণ পাল এমনই এক স্নিগ্ধ নির্মল কৈশোর প্রেমের অনুভূতি মনীষার স্মৃতিচারণায় মাত্র দুই পৃষ্ঠায় 'শেওলা' গল্পে তুলে ধরেছেন। গল্পকাহিনিতে এক্সিকিউটিভ অফিসার সুবিনয় বোস তার স্ত্রী মনীষা আর ছোট দুই ছেলে-মেয়েকে নিয়ে সতু ড্রাইভারের গাড়িতে করে বেড়াতে যাবার মাঝপথেই গাড়িটি বিকল হয়ে পড়ে। আর তখন পথের ক্লান্তি দূর করতে সুবিনয় তার পরিবারসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আবিষ্ট চা বাগানে প্রবেশ করে। সেখানে পৌঁছে সুবিনয় ও মনীষা অতীত স্মৃতিতে হারিয়ে যায়। একসময় তাদের জলতেষ্টা পেলে মনীষা সুবিনয়কে বলে— "ঐদিকে আরও একটু গেলে দেখবে খুব সুন্দর একটা ঝর্ণা আছে। খুব পরিষ্কার জল। খেতেও পারবে।"[২৬]

কিন্তু এই ঝর্ণার উপস্থিতির কথা মনীষার জানার কথা নয়। এমনকি তার বাবার বাড়িও এই চা বাগান থেকে অনেকটা দূরে, আরেকটা চা বাগানের কাছে। অথচ সে এমনভাবে বলল যেন এটা তার খুব চেনা জায়গা। সুবিনয়ের মনে প্রশ্ন জাগে। একটু পরেই—

> "আবিষ্কারের আনন্দ নিয়ে ছেলেমেয়ে দুটি হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির। ছেলেটি বলল, জান বাবা, ঝর্ণাটার পাশেই একটা বড় পাথরের গায়ে মায়ের নামটা খোদাই করে লেখা রয়েছে। এখনও দিব্যি পড়া যায়। মনীষার টুকটুকে ছোট্ট মেয়েটাও বলল, মার নামটার পাশে যোগ চিহ্ন দিয়ে অন্য একটা নামও লেখা রয়েছে। তবে খুব শেওলা জমে আছে তো তাই পড়া যায় না।"[২৭]

সুবিনয় কিছু বলার আগেই মনীষা শান্ত আর ধীর কণ্ঠে বলল, নামটা হবে অনিরুদ্ধ। তারপর দীর্ঘশ্বাস চেপে বলে "তবে বানানে ভুল থাকতে পারে, ক্লাস এইটের একটা ছোট্ট মেয়ে অত শক্ত বানান পারবে কেন?"[২৮] এভাবেই লালিত হয়ে চলেছে মনীষার মনে তার কৈশোর প্রেমের স্মৃতি। হয়তো কালের প্রভাবে আমরা জীবনের অনেক স্মৃতি, অতীত প্রেম ভুলে যাই বা একটু মলিন হয়ে যায়। কিন্তু শ্যাওলা জমা জলের গভীরেও যেমন অন্তঃসলিলা জলের ফল্গুধারা বয়ে চলে, ঠিক তেমনি মানব মনেরও কোথাও না কোথাও সকলের অগোচরে অতীত প্রেমের স্নিগ্ধতা, স্মৃতি, মাধুর্য, যন্ত্রণা লালিত হয়ে চলে।

বিশ্বাস, ভালোবাসা আর বিশুদ্ধ মানসিকতাই সুখী দাম্পত্য জীবনের মূল চাবিকাঠি। একটিমাত্র সন্দেহই সেই সম্পর্কের সুতোয় চির ধরাতে পারে। হরিভূষণ পালের 'ফাটল' গল্পেও একটি নিরর্থক সন্দেহ শান্তনু আর মন্দিরার মাত্র দু'মাসের দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরায়। গল্পকথনে শান্তনু এবং মন্দিরার বিয়ের পরেও আত্মীয়-স্বজনের আসা-যাওয়া সবমিলিয়ে হাজারো ব্যস্ততায় তারা এখনো অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারেনি। তবে শান্ত মাধুর্যের বিবেচক স্ত্রী পেয়ে শান্তনু নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে। এক সময় মন্দিরার মামার বাড়িতে তারা নিমন্ত্রিত হয়ে এলে নবদম্পতির আগমন উপলক্ষে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরাও আমন্ত্রিত হয়। সেই সূত্রে অমল নামে এক যুবকও তাদের বাড়িতে আসে। অমল দীর্ঘদিন ধরে মন্দিরা ও তার পাঁচ-ছয় জন মামাতো বোনদের প্রাইভেট টিউশন পড়াতে পড়াতে এই বাড়িরই একজন সদস্যের মতো হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত বলা দরকার, মন্দিরা তার মামার বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করেছে। একসময় মন্দিরার বিয়ের বয়স হলে তার

মামার বাড়ির লোকেরা অমলকে তার বর হিসেবে নির্বাচন করেছিল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে শান্তনুর সাথে মন্দিরা গাঁটছড়ার বাঁধনে বাঁধা পড়ে।

আমন্ত্রিত শান্তনু একদিন রাতে বাইরে থেকে ঘরের ভেতরকার দু-তিনজন মহিলার কথোপকথনে অমলের সাথে মন্দিরার বিবাহ প্রসঙ্গ শুনতে পায়। এই থেকে শান্তনুর মনে সন্দেহ বাসা বাঁধে। এক নিরর্থক অভিমানে তার পুরো শরীর ও মন আচ্ছন্ন হয়ে যায় তখন। প্রতিমুহূর্তে সে আবিষ্কার করতে চাইছে মন্দিরা এবং অমলবাবুর মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল কিনা বা আছে কিনা। তখন তার কথায় কথায় অমলবাবুর প্রসঙ্গ টানা শান্তনু ও মন্দিরার সম্পর্কে এক টানাপোড়েনের সৃষ্টি করে। একসময় শান্তনু তার পাঁচ-ছয় জন শালীকে আমন্ত্রণ জানায় তার বাড়িতে বেড়াতে আসার জন্য। তখন শান্তনু অমলবাবুকে চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ করার কথা বলে মন্দিরাকে। সে এক প্রকার জোর করেই মন্দিরে কি দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নেয়। কিন্তু সে চিঠি শান্তনু পোস্ট করেনি। তার এত সবকিছুর মূলে ছিল মন্দিরাকে পরীক্ষা করা যে, সে কিছু লুকোচ্ছে কিনা। একসময় চিঠিটি মন্দিরার হাতে লাগে। তখন মন্দিরাও বুঝতে পারে শান্তনুর মানসিকতা। আর তখন—

> "বিস্মিত মন্দিরার মেরুদন্ড পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে একটা শীতল স্রোত যেন ক্রমশ নিচের দিকে নামতে থাকে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে কপালে। সে নিশ্চিত হল, অমলদাকে নিয়ে কিছু একটা সন্দেহ দানা বেঁধেছে শান্তনুর মনে।... আজ অনেক কিছুই নূতন করে চোখে ভাসছে। শান্তনুর সব কথার, সব আচরণের একটা নূতন অর্থ একটু একটু করে খুলে যাচ্ছে মন্দিরার চোখের সামনে।"[২৯]

শালীকাদের সঙ্গে একদিন রাতে কথা প্রসঙ্গে অমলবাবুর কথা উঠলে শান্তনু বুঝতে পারল তার সমস্ত ধারণাই ছিল ভ্রান্ত। সে বিনা কারণেই মন্দিরাকে ভুল বুঝেছে এবং মনে মনে খুশি হল এই ভেবে যে, তার মানসিকতা ও চিঠিখানি মন্দিরার কাছে অনাবিষ্কৃত রইল। লেখক বলেছেন—

> "শান্তনু আজ অনেকটাই হাল্কা। গত দু'দিনের জমজমাট আড্ডা ছাড়াও তার বুকের সে কাঁটার খোঁচাটাও যেন আর নেই। তার ভাবতে ভাল লাগছে যে মন্দিরার কাছে ব্যাপারটা সে গোপন রাখতে পেরেছে। অন্তত মন্দিরার চোখে ছোট হয়ে যায়নি। অমলবাবুকে নিয়ে মন্দিরার ওপর তার সব কয়টি এক্সপেরিমেন্টই এখন তাকে এক অনাবিল খুশীর জগতে পৌঁছে দিয়েছে। খুব ভাল লাগছে তার।"[৩০]

মন্দিরার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও নিজের প্রতি অনুতপ্ত শান্তনু শেষে মন্দিরাকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু ঘরে ঢুকে সে দেখে মন্দিরা ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্লান্ত মন্দিরার স্নিগ্ধ সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে সান্তনু তার কপালে চুমু খেতে গিয়ে দেখে সেই চিঠি।—

> "ফ্যানের বাতাসে মুখ খোলা চিঠিটা বিশাল এক হাঙরের মতো একবার হাঁ করছে, আবার হাঁ বন্ধ করছে। শান্তনু স্তব্ধ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে তার পা দুটি পাথর হয়ে যেতে থাকে।"[৩১]

এভাবেই নিতান্ত একটি ভ্রান্ত সন্দেহ, নিরর্থক ক্ষোভ একটি সুখী দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরায়। এই বিষয়টিকেই লেখক অতি সাধারণ কাহিনি এবং সুকৌশল বর্ণনার মাধ্যমে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

হরিভূষণ পালের 'সুখ শান্তির ডালপালা' সমাজের একেবারে সাধারণ বিষয় নিয়ে লেখা একটি গল্প। সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানসিকতায় আরোপিত নীতি-আদর্শের বাস্তবিক গদ্য আখ্যান এই গল্প। গল্প কাহিনিতে অলক, তার স্ত্রী মনীষা, বৃদ্ধ মা ও পাঁচ বছরের ছেলে তোতনকে নিয়ে সুখের সংসার। মাঝে মধ্যে তাদের পরিবারে ঝড় আসলেও সকলের সুবিবেচনা ও বুদ্ধিতে ঝড় তেমন কিছু ক্ষতি করতে পারে না। অলোক ঠান্ডা মেজাজের মানুষ। সে তার বন্ধুদের মুখে পারিবারিক নানা সমস্যার কথা শুনে ভাবে—

> "অন্য কোথাও যাই হোক না কেন, সে খুব ভালই আছে। সুখ শান্তির ডালপালাগুলো তার ছোট্ট সংসারটিকে এমন ভাবে জড়িয়ে রেখেছে যে অভাব অনটন বা ছোটখাটো দুঃখ বাইরের আলো দেখার ফাঁক-ফোকরই খুঁজে না।"[৩২]

সন্ধ্যায় ছেলেকে পড়াতে বসানো, মনীষার যাবতীয় বিষয় সামলানো, বৃদ্ধ মায়ের নাতির আবদার মেটানো ও পূজার্চনায় ব্যস্ততা এবং অলকের অর্থ উপার্জনের মধ্য দিয়ে সংসারটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য স্বামী-স্ত্রীর ছোটখাটো মিথ্যা বলা বা সামান্য অভিনয় করাকে তারা দোষের মনে করে না। একদিন মনীষার পিসতুতো বোনের বিয়ের আমন্ত্রণ আসলে তারা কবে বিয়েতে যাবে, বিয়েতে কী উপহার দেবে, তোতনকে নিয়ে যাওয়া যাবে কিনা, বৃদ্ধা মায়ের অসুস্থতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য তৈরি হয়। তখন বিয়ের উপহার হিসেবে মনীষা শাশুড়ির পুরানো কানের দুল ভাঙিয়ে নতুন গড়ে দেওয়ার কথা বললে অলক চটে যায়। সেদিনই রাতে তোতন বাবার কাছে গল্প শোনার আবদার করলে সে এই বিষয়টাকেই রাজা-রানীর গল্প হিসেবে পরিবেশন করে। এই গল্পটি তোতন পরের দিন তার ঠাকুমাকে বলে। তখন ঠাকুমা তার বিবেচনা বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে পুত্র ও পুত্রবধূকে বললেন—

> "আমি বলি কি, আমার তো এক জোড়া কানের মকড়ি ছিল। এখন কোথায় রয়েছে তাও বলতে পারব না। বোধহয় তোমাদের ঘরের আলমারীতে। অনেক পুরানো জিনিস। ওজনও কম হবে না। এখন তো ওরকম মুকড়ি আর কেউ পরে না। আমিও আর ওগুলি পরতে যাব না। ওখান থেকে একটা ভাঙ্গিয়েই এখনকার ডিজাইন মত এক জোড়া কানের দুল করিয়ে নাও।"[৩৩]

তাতে মনীষা তার শাশুড়ির প্রতি খুশি হয়। বিয়ের দিন তারা বিয়ে বাড়িতে পৌঁছায়। সেখানে গিয়ে মনীষা স্বামী ও শাশুড়ির গুণপনায় পঞ্চমুখ, এমনকি অলকও স্ত্রীর গুণগান গাইতে লাগল। তা শুনে বিয়ে বাড়ির সকলেই আনন্দে আত্মহারা। মনীষা তার স্বামীর মিথ্যা গুণগানে বলে–

> "তোদের জামাইবাবুর তো সেই এক কথা। বিয়ের চিঠি পাবার পর থেকেই বলে আসছে সুন্দরী শালীর বিয়েতে সোনার অলঙ্কার ছাড়া নাকি আর কিছু মানায় না। আমি ভাল একটা তাঁত সিল্কের কথা বলায় আমাকে তো প্রায় তেরেই এল। আমিও বলে দিয়েছি, কর বাপু তোমার যা খুশি! তোমাদের শালী জামাইবাবুর মধ্যে আমি নেই!"[৩৪]

বিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অলক গুরু জনদের সামনে সিগারেট খেতে পারেনি বলে তাই একটি সিগারেট কিনে ধরাল। আর মনীষা শাশুড়ির জন্য একটি প্রাণের খেলি কিনে নিল। মনীষা মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিল যে, শাশুড়িকে গিয়ে বলবে এটি পিসীমা পাঠিয়েছে। তারা বাড়িতে গিয়ে দেখে নাতি ও ঠাকুমা গল্প করছে। নাতির গল্পের কোন একটা জায়গায় ঠাকুমা আপত্তি করলে নাতি বলে—

> "তুমি বুঝি জানো না ঠাকুমা, এগুলি তো সব ছোট খাটো মিথ্যা। এসব মিথ্যেতে দোষ হয় না। এগুলো তো সংসারের ডালপালা। বড় বড় ঝড় তুফান থেকে সংসারটাকে রক্ষা করে। তাই অমন মিথ্যেতে দোষ হয় না।"[৩৫]

শিশু ছেলের মুখে একথা শুনে অলক ও মনীষা পরস্পরের দিকে তাকাল। আর মনীষার হাতের পানের খিলি ক্রমশ ভারী হতে লাগল। সত্যিই কি এসব মিথ্যা অভিনয় সংসারকে টিকিয়ে রাখে? নাকি একটু একটু করে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিসর্জন দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমরা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছি। আখেরে এতে মানুষের 'মান' ও 'হুশ' দুটোই বিপন্ন হচ্ছে। এই গল্পের বিষয় অতি সাধারণ। কিন্তু গল্পের আবেদন খুবই

প্রাসঙ্গিক। লেখক পাঠক বর্গকেও এই গল্প অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে আত্মবিশ্লেষণের সুযোগ করে দিয়েছেন। এখানেই গল্পকারের সার্থকতা।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ, রাজীব। ত্রিপুরার বাংলা ছোটোগল্প ও গল্পকার। নারায়ণ ভট্টাচার্য, হরিভূষণ পালের ছোটোগল্প সমকালের দর্পণ। বুক ওয়ার্ল্ড, ২০১৯, আগরতলা, পৃ. ২০৮।
২. পাল, হরিভূষণ। আগামীকাল চব্বিশ ঘন্টা ত্রিপুরা বন্ধ। সৈকত প্রকাশন, ২০০৩, আগরতলা, পৃ. ৯।
৩. তদেব, পৃ. ১১।
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সঞ্চয়িতা, হঠাৎ দেখা। দে'জ পাবলিশিং, ২০০১, কলকাতা, পৃ.৩৩২।
৫. পাল, হরিভূষণ। আগামীকাল চব্বিশ ঘন্টা ত্রিপুরা বন্ধ। সৈকত প্রকাশন, ২০০৩, আগরতলা, পৃ. ১১।
৬. তদেব, পৃ. ১২।
৭. তদেব, পৃ. ১২।
৮. তদেব, পৃ. ৪৮।
৯. তদেব, পৃ. ৪৯।
১০. তদেব, পৃ. ৪৯।
১১. তদেব, পৃ. ৫১।
১২. তদেব, পৃ. ৫২।
১৩. তদেব, পৃ. ৫৩।
১৪. তদেব, পৃ. ৫৪।
১৫. তদেব, পৃ. ৫৫।
১৬. তদেব, পৃ. ৫৭।
১৭. তদেব, পৃ. ৫৭।
১৮. তদেব, পৃ. ৭৪।
১৯. তদেব, পৃ. ৭৬।
২০. তদেব, পৃ. ৭৭।
২১. তদেব, পৃ. ৭৭।
২২. তদেব, পৃ. ৭৭।
২৩. পাল, হরিভূষণ। সময়ের পদচিহ্ন। সৈকত প্রকাশন, ২০০৭, আগরতলা, পৃ. ১০।
২৪. তদেব, পৃ. ১২।
২৫. তদেব, পৃ. ১৬।
২৬. তদেব, পৃ. ১৭।
২৭. তদেব, পৃ. ১৮।
২৮. তদেব, পৃ. ১৮।
২৯. পাল, হরিভূষণ। জলছবির আয়না। সৈকত প্রকাশন, ২০০৫, আগরতলা, পৃ. ৩৫।
৩০. তদেব, পৃ. ৩৮।
৩১. তদেব, পৃ. ৩৮।

৩২. তদেব, পৃ. ৫৬।
৩৩. তদেব, পৃ. ৬১।
৩৪. তদেব, পৃ. ৬২।
৩৫. তদেব, পৃ. ৬৩।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. পাল, হরিভূষণ। আগামীকাল চব্বিশ ঘন্টা ত্রিপুরা বন্ধ। সৈকত প্রকাশন, ২০০৩, আগরতলা।
২. ঘোষ, রাজীব। ত্রিপুরার বাংলা ছোটোগল্প ও গল্পকার। নারায়ণ ভট্টাচার্য, হরিভূষণ পালের ছোটোগল্প সমকালের দর্পণ। বুক ওয়ার্ল্ড, ২০১৯, আগরতলা।
৩. পাল, হরিভূষণ। জলছবির আয়না। সৈকত প্রকাশন, ২০০৫, আগরতলা।
৪. পাল, হরিভূষণ। সময়ের পদচিহ্ন। সৈকত প্রকাশন, ২০০৭, আগরতলা।